সংস্কারের অর্থনীতি, রোগ-চিকিৎসা ও সমাজকল্যাণ

নির্মলেন্দু সরকার

পৃথিবী বিখ্যাত মেডিসিন-শাস্ত্রের পাঠ্যবই 'হ্যারিসনস্ প্রিন্সিপিলস্ অব ইন্টারনাল মেডিসিন' (Harrison's Principles of Internal Medicine) ১৯৫০ সালে তার প্রথম প্রকাশে প্রথম কথা লেখক যেটা লিখেছিলেন, যা এক চিরকালীন সত্যের মর্যাদা পেয়েছে, সেই কথা দিয়েই শুরু হোক এই প্রবন্ধের অবতরণিকা। অদ্ভুত সেই সত্যবচনে বলা হয়েছে, "মনুষ্যভাগ্যে চিকিৎসক হওয়ার চাইতে বড় সুযোগ, বড় দায়িত্ব বা দায়বদ্ধতা আর কিছুতেই হতে পারে না।" (No greater opportunity, responsibility or obligation can fall to the lot of a human being than to become a physician.) অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে এসে এই কথাগুলির অন্তর্নিহিত সত্যের আলোকে আধুনিক চিকিৎসক ও চিকিৎসা-ব্যবস্থার পুনর্মূল্যায়ন খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে— বিশেষ করে আধুনিক আর্থ-সামাজিক সভ্যতার প্রেক্ষিতে। দেহধারী মানুষ অসুস্থ হবেই কোনো না কোনো সময়ে, আর অসুস্থ হলেই তার কাছে নিরাময়ের জন্য চিকিৎসকের প্রয়োজন অনুভূত হবেই। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য যাই হোক না, আজকের আধুনিক চিকিৎসক ঠিক আর আগের ব্যক্তি-চিকিৎসক নন— তিনি এই আধুনিক যুগে এক অত্যাশ্চর্য চিকিৎসা-ব্যবস্থার হাতে এক যন্ত্রচালিত পুতুলের মতো দম দেওয়া ব্যক্তিত্ব। তাঁর ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে পাদনখকণা পর্যন্ত শরীরের সমস্ত কোষ-কলা এক দূরসঞ্চারী নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত হয়ে চলেছে। এখন কী এই অত্যাশ্চর্য চিকিৎসা-ব্যবস্থা? কী তার জন্ম-কর্ম? এর কোনো সহজ উত্তর নেই আর সহজ করে কিছু বলাও সম্ভব নয়। তবে একটি কথা সবসময়েই সত্যি যে, চিকিৎসক ও চিকিৎসা-ব্যবস্থা এই বর্তমান সমাজ ব্যবস্থারই অঙ্গ বা অংশ আর এরই মধ্যে আমাদের উত্তর খুঁজতে হবে। এবং এর কল্যাণেই সকল কল্যাণ, সবার কল্যাণ।

পৃথিবীর সমস্ত দেশে দেশেই মানুষ তাদের মতো করে নিজস্ব সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলেছে এবং তার মধ্যেই তারা ব্যক্তির কল্যাণ তথা সমষ্টির কল্যাণ নিয়ে ভেবেছে। এবং সবদেশেই ব্যক্তি-কল্যাণ ও সমষ্টি-কল্যাণের মধ্যে একটা আপাত-বিরোধিতার ভাব ঘুচিয়ে এক সর্বগ্রহণযোগ্য আদর্শ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা হয়েছে এবং হচ্ছে, আর সবসময়েই এটা মানবজাতি ও মানব সভ্যতার কাছে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। আজকের যে সমাজব্যবস্থা আমরা দেখছি, তা মানবসভ্যতার বিবর্তনের পথেই এসেছে। আর প্রাচীন সমাজব্যবস্থা মেনে এর রূপান্তরিত চেহারায় আমরা যখন একে দেখতে বসি বা বিশ্লেষণ করতে বসি, তখন আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন প্রাচীনকালের সঙ্গে এর কোনোকালেই কোনো যোগ ছিল না। আধুনিক সমাজ গর্বিত হয়ে ভাবছে তারা এমন এক সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলেছে বা তোলার পথে, যা প্রাচীন কালীয় 'আদিম' সমাজ ব্যবস্থা থেকে অনেক পরিশীলিত,

উন্নত ও প্রায় ত্রুটিহীন। এই সমাজব্যবস্থায় তারা সমষ্টিগত উন্নতির প্রেক্ষাপটে ব্যক্তি মানুষের সীমাহীন উন্নতির প্রতিশ্রুতি দিতে পেরেছে! প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় আমরা একটা জিনিস দেখেছি— বিশেষ করে আমাদের ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে, সেটা হচ্ছে 'ধর্ম' বা স্বধর্মই এর প্রধান চালিকাশক্তি এবং এ সমস্তই রয়েছে এক ঈশ্বরভাবনা ও আধ্যাত্মিকভাবনায় জারিত হয়ে। সমস্ত সমাজ-চিন্তার মধ্যে ছিল চতুর্বর্গীয় সাধনার সোপান বা পাদবিন্যাস— ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। আধুনিক সমাজব্যবস্থায়— যা বিগত প্রায় দুইশত বৎসরব্যাপী ইউরোপীয় জঙ্গমশক্তির বিস্তার ও আগ্রাসনের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ, সমস্ত পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। আমরা দেখেছি এই চতুর্বর্গের মধ্য থেকে শুধু 'অর্থ ও কাম' উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে এবং ধর্ম ও মোক্ষ প্রায় বিতাড়িত ও উপহাসিত। তাই আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদ্‌দের পরিভাষায় আধুনিক সমাজব্যবস্থা হয়ে উঠেছে এক 'আর্থ-সামাজিক' ব্যবস্থা— যেখানে সমস্ত কিছুর 'মাপকাঠি' শুধু 'অর্থ'।

পৃথিবীর সমস্ত দেশই আজ একটা সাধনায় মগ্ন— কীভাবে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন, পরিমার্জন তথা উন্নয়ন করা যায়, তথাকথিত তাদের দেশকে উন্নত, উন্নততর বা উন্নততম করা যায়। বিগত কয়েক শতাব্দী ধরেই বহু বাগ্‌-বিতণ্ডা-বিতর্ক হয়ে চলেছে কীভাবে মানবজাতি ও মানবসভ্যতার আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ করা উচিত বা করতে হবে। বহু খ্যাতনামা দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ্‌, রাজনীতিবিদ্‌ তথা সমাজের বহু মান্যগণ্য অন্যান্য বক্তিগণ এই বিষয়ে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত দিয়েছেন বা দিচ্ছেন। সাধারণ মানুষ আমাদের মতো যারা, তারা এইসব মতামতে কিছুটা বিভ্রান্ত হলেও আমরা আজ জেনেছি যে, পৃথিবীর সমাজব্যবস্থা তথা মানবসভ্যতা অতীতের রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্রকে পেছনে ফেলে এখন বহুচর্চিত বহুকাঙ্ক্ষিত ও বহুপ্রশংসিত গণতন্ত্র-এ এসে পৌঁছেছে, আর এই গণতন্ত্রকেই প্রকৃত সম্মান দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী দুই আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা— ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র নিজেদের মধ্যে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। এই লড়াইয়ের বিচিত্র ও চমকপ্রদ দৃশ্য মূলতঃ গত দুই শতাব্দী জুড়ে দেখতে দেখতে আমরা আজ একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পৌঁছে গেছি। ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের এই লড়াইয়ে হার-জিৎ-এর বিচার ভাবীকাল হয়তো করবে, কিন্তু বর্তমানে প্রায় সমস্ত পশ্চিমী ধনী দেশগুলি নিজেদের জয়ধ্বনি দিতে শুরু করেছে। সবাইকে দিয়ে প্রায় স্বীকার করিয়ে নিয়েছে যে আধুনিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার প্রকৃত কল্যাণের জন্য ধনতন্ত্রই (বা অর্থতন্ত্র!) একমাত্র পথ। এই ধনতন্ত্রের সংজ্ঞা ও শর্তও তাঁরা বেঁধে দিয়েছেন। লক্ষণীয় 'সমাজতন্ত্রে'র সংজ্ঞা ও শর্তও তাঁদেরই নির্দিষ্ট করে দেওয়া। তাঁরা পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশকেই, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে, অর্থনৈতিক সংস্কারের বিধান দিচ্ছেন নিজেদের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য। 'ভারতবর্ষে'রও বোধহয় আর পিছনে ফিরে তাকাবার প্রয়োজন নেই! এই প্রসঙ্গে আরও কিছু কথা বলে মূল প্রসঙ্গে আসব।

ইতিহাসও যার সম্বন্ধে কিছু বলতে ভয় পায়, সেই এক কোন্‌ সুদূর অতীতে 'ভাগ্যদেবীর

সাক্ষাৎপ্রার্থী' হয়ে ভারতবর্ষ তার যাত্রা শুরু করেছিল। আবার এই সময় এল ১৯৪৭ সালে, যখন ভারত নতুন করে ভাগ্যদেবীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করল। শুরু করল 'স্বাধীন ভারতবর্ষ' 'আধুনিক ভারতবর্ষ'— তার যাত্রা। বিদেশি অত্যাচার ও ভারতবর্ষের বুকে মাতৃভূমি দ্বিখণ্ডীকরণের ফলে কোটি কোটি ভারতবাসী নিরীহ ও অসহায়ভাবে হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ ও ভিটে-মাটি উচ্ছেদের শিকার হয়ে দিগ্বিদিকে ছুটে বেড়াতে লাগল। নিজের ভাগ্য নিজে নির্ধারণের কোনো অধিকার সেদিন তাদের হাতে ছিল না। আর তারই মধ্যে ভারতবাসীর জন্য ব্যবস্থা হল সুশাসনের— 'সংবিধান' প্রণীত হল, 'আইনসভা' গঠিত হল, বিচার ও ন্যায়ের দণ্ড প্রসারিত হল, আর দারিদ্র্য-অশিক্ষা-কুসংস্কার ও স্বাস্থ্যের জন্য বিধান হল তথাকথিত 'সমাজতান্ত্রিক' ধাঁচের অর্থনীতি। অতি ধীরে হলেও ভারতবর্ষের বুকে জমে থাকা শত শতাব্দীর অন্ধকার যেন একটু একটু করে কাটতে লাগল।

কয়েক দশকের মধ্যে ভারতের কিছু জ্ঞানী-গুণী মানুষ বলতে লাগলেন যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মোহ থেকে বেরিয়ে এসে ভারতবর্ষকে বরণ করে নিতে হবে মুক্ত অর্থনীতি। বহু বাগ্-বিতণ্ডার বিস্তার হতে থাকল। যার বিন্দুবিসর্গও সাধারণ ভারতবাসী বুঝতে পারে না আর এরই মধ্যে 'ভারতবর্ষ' ফেঁসে গেল তথাকথিত 'বহির্বাণিজ্য লেনদেন উদ্বৃত্ত সঙ্কট' বা Balance of Payment Crisis-এর জালে। আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডার (International Monetary Fund)-এর উপদেশ তথা তাড়নায় ভারতবর্ষ বাধ্য হয়ে শুরু করে দিল তার 'অর্থনৈতিক সংস্কার' — যার আসল কথা হল — খুলে দিতে হবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ (International Trade and Investment), সরকারি স্তরে সমস্ত নিয়ন্ত্রণ তুলে নিতে হবে (deregulation), শুরু করতে হবে বেসরকারিকরণ (privatisation), কর-সংস্কার (tax-reforms) এবং মুদ্রাস্ফীতির জন্য নিতে হবে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা। এটা শুরু হল বিগত শতাব্দীর নব্বুইয়ের দশকে আর সমস্ত ভারতবাসীর বিভ্রান্তির ও বিস্ময়ের মধ্য দিয়ে আজও সেই 'সংস্কার' অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। কী ফল হয়েছে! বিশ্লেষণ বা বিচারের ক্ষেত্র বর্তমান নিবন্ধ নয়। এখানে শুধু আমরা দেখার চেষ্টা করব এই 'অর্থনৈতিক সংস্কার' আমাদের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা ও চিকিৎসককে কীভাবে বদলে দিচ্ছে বা দিয়েছে— আর তার প্রভাবে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও কোটি কোটি হতদরিদ্র ভারতবাসীর কী উপকার হয়েছে।

প্রথমেই আমরা দেখি, আমাদের এই ভারতবর্ষের বুকে যে স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা তথা চিকিৎসা ব্যবস্থা কায়েম হয়ে বসেছে, তার মূল উৎস কোথায়, কী উদ্দেশ্যে তাঁর সূচনা হয়েছিল এবং কীভাবে ধীরে ধীরে আর্ত-পীড়িত রোগাতুর মানুষের নিরাময় বা সেবার ভূমিকা ঝেড়ে ফেলে অর্থগৃধ্নু এক শিল্প-ফাঁদ আগ্রাসী হয়ে উঠেছে। একজন চিকিৎসক নিজের পেশাদারী জীবনে রোগীকে নিরাময় করার ব্রত নিয়েই কাজ করেন এবং সেইভাবেই তাঁকে স্বাস্থ্য-পরিষেবা দেবার চেষ্টা করেন। একজন অর্থনীতিবিদ্ যখন একজন চিকিৎসকের কাছে রোগী হিসাবে আসেন, তখন তিনি চিকিৎসককে একজন রোগীবান্ধব হিসাবেই দেখেন।

এই দেখা ব্যষ্টিগতভাবে দেখা। কিন্তু তিনিই যখন চিকিৎসককে অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গী মেলে অর্থাৎ সমষ্টিগতভাবে দেখেন, তখন তাকে এক অর্থনৈতিক মাধ্যম (economic agent) হিসাবেই চিহ্নিত করেন এবং সেইভাবেই তাকে সবকিছু বিচার করতে বলেন। আধুনিক 'অর্থনৈতিক সংস্কারে' এই অর্থনৈতিক দিগ্‌দর্শনই আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা ও চিকিৎসকের উপর বিরাট প্রভাব ফেলে দিয়েছে, তার পুরোনো সমস্ত ধ্যান-ধারণাকে যেন সমূলে উৎপাটন করে দিতে চাইছে। আমরা অবশ্য এখন এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনায় যাব না। তার আগে ভারতবর্ষে আধুনিক চিকিৎসা-ব্যবস্থার ইতিহাস ও তার রূপরেখার দিকে একবার নজর ফেরাব।

আজকের ভারতবর্ষে যে স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা বা চিকিৎসা-ব্যবস্থা আমরা দেখতে পাই, তা প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের দান। ভারতীয় সমাজ চিরকালই বিভিন্ন জাতি, শ্রেণি তথা গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। এই বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে একটা বৃহত্তর ঐক্যের প্রেক্ষাপট সত্ত্বেও ছোটোখাটো স্বার্থ বা আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্বও চিরকালই ছিল। জাতীয় স্তরে যে কোনো সার্বজনীন সুযোগসুবিধাগুলির সমবণ্টন কখনোই ত্রুটিহীন ছিল না— স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে এটা আরও প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। স্বাস্থ্য-পরিষেবা ব্রিটিশ ভারতে প্রথম চালু হয়েছিল ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর জন্য— সাধারণ ভারতবাসীর সেখানে কোনো স্থানই ছিল না, যদিও সাধারণ ইংরাজ নাগরিকদের সেখানে চিকিৎসার সুযোগসুবিধা সব ছিল। কিন্তু শীঘ্রই ব্রিটিশ শাসকদের বোধোদয় হল যে দেশের সাধারণ নাগরিকদের স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে সংক্রমণজনিত সম্ভাবনায় তাঁদের সৈন্যবাহিনী তথা ইংরাজ নাগরিকদের স্বাস্থ্য বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়বে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সাধারণ দেশীয়গণ বসবাস করতে বাধ্য হওয়ায় তাদের মধ্যে মাঝে মাঝেই বিভিন্ন ধরনের রোগ-মহামারী দেখা দিত।

এরই ফলশ্রুতি হিসাবে ১৮৫৯ সালে গঠিত হল দেশের তিনটি বিভাগ বা প্রেসিডেন্সিতেই (Bengal Presidency, Madras Presidency and Bombay Presidency) জনস্বাস্থ্য আয়োগ (Commission of Public Health) যারা সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ও বিভিন্ন ধরনের রোগ-মহামারীর নিবারণ বা প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ ও নির্দেশ দিলেন। এর আগে অবশ্য ব্রিটিশ ভারতে তিনটি মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। সর্বপ্রথম মেডিকেল কলেজটি স্থাপিত হয় ১৮৩৫ সালে কলকাতায় এবং তার সামান্য পরেই স্থাপিত হয় বোম্বাইয়ে (এখনকার মুম্বই)। তবে এই কলেজগুলি স্থাপনের মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশ ভারতে আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের সুযোগ ভারতবাসীর সামনে খুলে গেলেও দেশের সার্বিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে তখনও কোনো বিশেষ চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়নি। যাই হোক, জনস্বাস্থ্য নিয়ে এরপর গঠিত হয় কেন্দ্রীয় স্যানিটারি বিভাগ (Central Sanitary Department)। ১৮৭০ সালে এবং ১৮৭৯ সালে ভারতের সমস্ত প্রদেশেই এর শাখা কেন্দ্র চালু করে দেওয়া হয়। একইভাবে অনুরূপ আরও কিছু পদক্ষেপ সরকার এই সময়ে গ্রহণ করেন যার মধ্যে আছে জন্ম ও মৃত্যু পঞ্জীকরণ আইন (Births and Deaths Registration Act, 1873), টীকাকরণ আইন (Vaccination Act, 1880), মহামারী

রোগ আইন (Epidemic Diseases Act, 1897) ইত্যাদি।

অনেক পরে ১৯৩৯ সালে প্রণীত হল মাদ্রাজ জনস্বাস্থ্য আইন (Madras Public Health Act) যা তৎকালীন ভারতবর্ষে পথিকৃৎ হিসাবে স্বীকৃত। স্বাস্থ্য নিয়ে ভারত ইতিহাসে আর এক উল্লেখনীয় ঘটনা ঘটল ১৯১৯ সালে যখন মন্ট্‌গোমারী-চেমস্‌ফোর্ড কন্‌স্টিটিউশনাল রিফর্মস্‌ (The Montgomary-Chelmsford Constitutional Reform) দেশের সমস্ত জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও ভাইটাল স্ট্যাটিস্‌টিকস প্রদেশগুলির নির্ধারিত মন্ত্রীদের প্রত্যক্ষ অধীনে পাঠিয়ে দিল। এরপর ১৯৩৫-এ ভারত সরকার আইন (Government of India Act, 1935) প্রণীত হল এবং প্রাদেশিক সরকারগুলোকে আরও ক্ষমতা দেওয়া হল। সমস্ত স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম তিনভাগে ভাগ করা হল— কেন্দ্রীয়, কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক ও প্রাদেশিক এবং এখনও সেই ভাগগুলোকে মান্যতা দিয়ে চলছে দেশের স্বাধীন সরকার। ব্রিটিশ ভারতে স্বাস্থ্য নিয়ে বিভিন্ন মূল্যবান পদক্ষেপগুলির মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে ১৯৪৩ সালে 'স্বাস্থ্য-সমীক্ষা ও স্বাস্থ্য-উন্নয়ন কমিটি' নিয়োগ করা যা সাধারণ্যে ভোরে কমিটি (Bhore Committee) নামেই অধিক পরিচিত। রোগ নিরাময়, রোগ নিবারণ ও উন্নয়নমূলক পরিষেবার (Curative, Preventive and Promotive Services) সমন্বয়নীতি অবলম্বন এবং সামাজিক ন্যায় সমদর্শন এবং সমষ্টির উন্নয়ন বিশেষ করে গ্রামীণ ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে এটাই ছিল এই কমিটির বিধানগুলোর মধ্যে প্রধান কথা। ভোরে কমিটির কতকগুলি কথা আজও ঔজ্জ্বল্যে চিরভাস্বর হয়ে জ্বলছে। এই কমিটি এক জায়গায় বলেছে, জাতীয় জীবনের স্বাস্থ্য উন্নতির জন্য অর্থ ব্যয় ও প্রচেষ্টা এক স্বর্ণালীরেখাঙ্কিত বিনিয়োগ যার সুফল পরে নয়, পাওয়া যায় তৎক্ষণাৎ, এবং বহুবর্ধিত উৎপাদন ক্ষমতার পথ দিয়ে। (Expenditure on money and effort on improving the national health is a gilt-edged investment which will yield not deferred dividends to be collected years later, but immediate and steady returns in substantially increased productive capacity.) ভোরে কমিটির মতে স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় বা বিনিয়োগ ভীষণভাবে এক সদর্থক পদক্ষেপ এবং বাজেটের ন্যূনতম ১৫ শতাংশ এর জন্য বরাদ্দ হওয়া উচিত। এর সঙ্গে তুলনা করলে আজকের দিনে সরকারি স্বাস্থ্য বাজেটে সরকারের ব্যয় সংকোচ ও কৃপণতা লজ্জায় সবার মাথা হেঁট করে দেয়। যাই হোক, ভোরে কমিটির সুপারিশগুলো সেই পরাধীন ভারতেই গৃহীত হয় এবং স্বাধীন ভারতেও বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরিকল্পনায় পথপ্রদর্শক হিসাবে এক প্রামাণ্য দলিল হিসাবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়।

স্বাধীনতা-উত্তর যুগে ভারতবর্ষে স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নয়ন-পরিকল্পনা দেশের অন্যান্য পরিকল্পনার সঙ্গে সমন্বয় করে শুরু হল যার মধ্যে রয়েছে— বেকারী দূরীকরণ, অপুষ্টি নিবারণ, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা, আবাসন নির্মাণ ও পরিবেশ উন্নয়ন। প্রথম দুই দশকে এই পরিকল্পনাগুলো পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবেই রূপায়িত হয়েছে। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের মধ্যে প্রথমেই বলতে হয় বিভিন্ন সংক্রামক রোগগুলোর নিয়ন্ত্রণ প্রয়াস যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য— ম্যালেরিয়া, কলেরা, স্মল পক্স বা গুটি বসন্ত, ফাইলেরিয়া,

যক্ষ্মা বা টিবি এবং পরিবার পরিকল্পনা। এক বিরাট অঙ্কের অর্থ এই রোগগুলি নিয়ন্ত্রণ বা দূরীকরণের জন্য বরাদ্দীকৃত হয়েছিল এবং এই কারণে সাধারণ স্বাস্থ্যের জন্য বরাদ্দও কাটছাঁট করা হয়েছিল। এই বিষয়ে ভারতের সাফল্য চমকপ্রদ কখনোই হয়নি যেমন বলা হয়েছিল। স্মল পক্স বা গুটি বসন্ত ছাড়া আর সমস্ত রোগই এখনও ভারতের বুকে তাদের বিভীষিকা, কিছুটা অবদমিত হলেও, বেশ চালিয়ে যাচ্ছে। পরিকল্পনায় ত্রুটি, বিশেষ করে তাড়াহুড়ো করে স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থাগ্রহণের উপর জোর দেওয়ার জন্য কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায়নি। যাই হোক, স্বাধীনতা-পরবর্তী স্বাস্থ্য-বিষয়ক পদক্ষেপগুলির মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (Primary Health Centre) স্থাপনা করা যার উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে স্বাস্থ্য-পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া যেখানে মূল উদ্দেশ্য হবে রোগ নিবারণ, রোগ নিরাময় ও স্বাস্থ্য পরিবর্ধন (Prevention, cure and promotion of health)। প্রথম স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি চালু হয়েছিল ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে এবং ভোরে কমিটির সুপারিশ রূপায়ণে এটাই ছিল প্রথম উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

পরবর্তীকালে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি ভারতের সমস্ত ব্লকস্তর পর্যন্ত ছড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা থাকলেও সেটা শেষ পর্যন্ত করা হয়নি। সংক্রামক ব্যাধিগুলি নিয়ন্ত্রণ বা দূরীকরণের প্রয়াস খুব বেশি সফলতা পায়নি। তার পিছনে প্রধান কারণ ছিল এই প্রাথমিক কেন্দ্রগুলির সংখ্যার স্বল্পতা এবং বহুক্ষেত্রেই পরিষেবার নিম্ন গুণমান। ভারত সরকার 'মুদালিয়ার কমিটি' গঠন করেছিলেন ১৯৫৯ সালে বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিষয়ক পরিকল্পনা বা ব্যবস্থাগুলির অগ্রগতি পর্যালোচনা (review) ও ভবিষ্যতের দিশা নির্দেশের জন্য। এই কমিটি দুঃখের সঙ্গে মন্তব্য করেছে যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য-পরিষেবা ভারতের অর্ধেক জনসংখ্যার কাছেই পৌঁছায়নি আর যেটুকুও পৌঁছেছে তার মান খুবই নিম্নস্তরের। এই কমিটির প্রধান পরামর্শ ছিল প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির সংখ্যা না বাড়িয়ে চালু কেন্দ্রগুলির গুণমান বাড়ানোর দিকে বেশি নজর দিতে হবে। প্রযুক্তি-নির্ভর স্বাস্থ্য পরিষেবার এবং আরও বেশি করে চিকিৎসক তৈরি করার উপরও জোর দেওয়া হয়েছিল।

মুদালিয়ার কমিটির পরামর্শে ভারতের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের রূপরেখা থেকে গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য কিছুটা অবহেলিত হল এবং চিকিৎসা-ব্যবস্থার অভিমুখ শহরকেন্দ্রিক ও নিরাময়মুখী (Cure oriented) হয়ে পড়ল। যাইহোক, কাঙ্ক্ষিত ফল না পেয়ে ভারত সরকার এরপর আরও অনেক কমিটি গঠন করেছিল যার বিস্তারিত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। এরপর ১৯৮৩ সাল নাগাদ অনুভূত হতে লাগল যে ভারতবর্ষের একটা জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি (National Health Policy NHP – 1983) থাকা দরকার। পূর্বসূরী তিনটি কমিটির— ভোরে কমিটি, মুদালিয়ার কমিটি এবং শ্রীবাস্তব কমিটির সুপারিশগুলির সমন্বয়ে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি (NHP) প্রণীত হল যার অনুঘটক হিসাবে সেই সময় কাজ করেছিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) Health for all by 2000AD (২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য) শ্লোগানটি আর 'আলমা আটা' ঘোষণা যা আহ্বান করেছিল সবাইকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা দেবার জন্য। জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিতে এই সুন্দর কথাটি বলা হয়েছিল— মানুষের প্রকৃত প্রয়োজন ও

অগ্রাধিকার সাপেক্ষে এক সার্বজনীন ও সর্বাঙ্গীণ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা করতে হবে যা তাদের ক্রয়ক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে (Universal, Comprehensive primary health care services which are relevant to the actual needs and priorities of the community at a cost which people can afford)। স্বাস্থ্য পরিষেবা যে এক জনের মৌলিক অধিকার সেই কথাটি অবশ্য জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি বলতে পারল না। যাই হোক, বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে ভারতের সাধারণ জনগণের স্বাস্থ্যোন্নয়ন ও স্বাস্থ্য-পরিষেবার বিভিন্ন পরিকল্পনা ও তাদের রূপায়ণ এগিয়ে চলেছিল কিন্তু কাঙ্ক্ষিত ফল প্রায় সবসময়ই অধরা থেকে গিয়েছিল। এর কারণ অবশ্য সেই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বাঁধা সুরের মধ্যেই নিহিত। ভোরে কমিটি সুপারিশ করেছিল সমগ্র ব্যয়-বরাদ্দের মধ্যে ন্যূনতম পনর (১৫) শতাংশ স্বাস্থ্যে বরাদ্দ করার জন্য— কিন্তু সেখানে বরাদ্দ হয়েছিল মাত্রা ৫.৯ শতাংশ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকীতেও বরাদ্দের মাত্রা ছিল যথাক্রমে ৫ শতাংশ ও ৪.২৫ শতাংশ। আর বর্তমানে নেমে এসেছে ১-২ শতাংশ। সুন্দর সুন্দর কথার অবতারণা হলেও স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য ব্যয় চিরকালই দুয়োরানী থেকে গেছে আমাদের দেশ-উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে আর 'স্বাস্থ্যই সম্পদ' এই আপ্তবাক্য ভুলে গিয়ে অন্য সম্পদে মন দিতে গিয়ে দেশের প্রকৃত উন্নয়ন আজও হয়নি।

যাই হোক, ইতিমধ্যে সারা পৃথিবী জুড়ে শুরু হয়ে গেছে বিশ্বায়ন আর তার সঙ্গে সঙ্গে নতুন বাজার অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক সংস্কার। এক নতুন অর্থনৈতিক দর্শন পৃথিবীর ধনী দেশগুলি থেকে বেরিয়ে সারা পৃথিবীকে প্রায় অভিভূত করে ফেলল। পরানুকরণপ্রিয় ও পরমুখাপেক্ষী ভারতীয় আধুনিক প্রজ্ঞা যেন এরই অপেক্ষা করছিল। বিশ্বায়নকে আশ্রয় করে বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার সাময়িকভাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে পিছনে ঠেলে ফেলে বিশ্ব স্বাস্থ্যের প্রধান চালক হয়ে উঠল। বিংশ শতাব্দীর অষ্টম ও নবম দশকে ভারতের স্বাস্থ্য নীতিতে এল এক বিরাট পরিবর্তন বিশ্ব ব্যাঙ্কের এই ধাক্কায়। তথাকথিত Structural Adjustment Programme and Health Sector Reforms (গঠন-বিন্যাস কার্যসূচি ও স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা সংস্কার) ভারতে পুরোপুরিভাবে জাঁকিয়ে বসল নব্বুইয়ের দশকে। বিশ্ব ব্যাংকের প্রদর্শিত পথে ভারতে স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার সংস্কার শুরু হয়ে গেল যার প্রধান উপাদানগুলো হচ্ছে— স্বাস্থ্য-বরাদ্দে কাটছাঁট করতে হবে, স্বাস্থ্য পরিষেবাকে বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য খুলে দিতে হবে, পরিষেবা ভিত্তিক মূল্য প্রদান চালু করতে হবে, সরকারি হাসপাতালে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহ দিতে হবে এবং প্রযুক্তি-কেন্দ্রিক জনস্বাস্থ্য কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। যার ফল হল, সমাজকল্যাণমূলক সরকারি অর্থ বরাদ্দ ভীষণ কমে যাওয়ায় দরিদ্র ভারতবর্ষ দারুণভাবে আহত হল। ভারতের তিন-চতুর্থাংশ জনসংখ্যার গড় আয় দিনে মাত্র কুড়ি টাকা আর তাদের কাছে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা পাবার কোনো সুযোগই থাকল না— স্বাস্থ্য-পরিষেবার প্রায় আশি (৮০) শতাংশ বেসরকারি মালিকানার আওতায় চলে গেল। মুষ্টিমেয় উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত অবশ্য এই ব্যবস্থায় খুশিই হল। আর ভারতের শাসককুল হয়ত কিছুটা বিবেকদংশন থেকে মুক্তি পাবার জন্যই এক নতুন জাতীয় স্বাস্থ্য

নীতি (National Health Policy (NHP) 2002) ঘোষণা করলেন যার প্রতিপাদ্য হল স্বাস্থ্য পরিষেবায় বেসরকারি অবদানকে আরও বাড়াতে হবে যাতে সমাজে যারা অর্থের বিনিময়ে পরিষেবা পেতে চান তাঁরা সে সুযোগ যেন ভালভাবে পান। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও অন্তিম স্তরে স্বাস্থ্য পরিষেবায় (Primary, Secondary and Tertiary) বেসরকারি অংশগ্রহণকে স্বাগত জানানো হল। এমনকি বেসরকারি বীমা সংস্থাগুলিকেও উৎসাহ দেওয়া হল যাতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসার ক্ষেত্রে একজন তাদের বীমা পরিষেবা গ্রহণ করতে পারেন। আর যারা সমাজের দরিদ্রশ্রেণি তাদের জন্য এই নীতি ঘোষণা করল যে এদের বিপুল সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি ব্যবস্থাপনায় সবাইকে স্বাস্থ্য-বীমা (Social Health Insurance Scheme) পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করাই হবে এর যথাযথ সমাধান (In the context of very large number of poor in the country, it would be difficult to conceive of an exclusive government mechanism to provide health services to this category. It has sometimes been felt that a social health insurance scheme, funded by the government, and with service delivery through the private sector, would be the appropriate solution.) কল্যাণকামী রাষ্ট্রের মুখোশ এত সহজেই খুলে যেতে পারে এক সময় ভারতবর্ষে কেউ হয়ত ভাবতে পারতেন না।

যাইহোক, এই অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে ভারতে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হল। সরকারি বদান্যতা ও ভরতুকির বিনিময়ে গড়ে উঠতে লাগল বিরাট বিরাট সুসংগঠিত কর্পোরেট হাসপাতাল ও বেসরকারি স্বাস্থ্য-পরিষেবা যা ভারতের ধনী ব্যক্তি ও বিদেশি স্বাস্থ্য-ভ্রমণার্থীদের (Health Tourists) চিকিৎসায় নিজেদের পরাকাষ্ঠা দেখাতে লাগল আর অন্যদিকে কোটি কোটি হতদরিদ্র ভারতবাসী প্রাথমিক চিকিৎসার সামান্য সুযোগও না পেয়ে মৃতপ্রায় অসহায় জীবনযাপন করতে বাধ্য হতে থাকল। স্বভাবতই, চারদিকে সমালোচনার ঝড় উঠতে লাগল আর তার ফলশ্রুতি হিসাবে ভারত সরকার চালু করতে বাধ্য হল 'জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন' বা National Rural Health Mission (NHRM) যার উদ্দেশ্য হল গ্রামীণ ভারতবর্ষে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি ঘটানো। গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন প্রথম লক্ষ্য স্থির করেছিল জাতীয় মোট উৎপাদনের (gross domestic product) স্বাস্থ্য বরাদ্দ যৎকিঞ্চিৎ ০.৯ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২-৩ শতাংশ করা যেটা পরবর্তী কোনো অর্থবর্ষেই কখনোই ১-১.৪৫ শতাংশ-এর বেশি হয়নি। স্বাস্থ্যের জন্য অর্থ-বরাদ্দে ভারত সরকারের এই কুণ্ঠা ও কার্পণ্যের জন্যই জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন এক বাগাড়ম্বর ভিন্ন আর কিছুই হয়নি। আসলে যেটা প্রধান সমস্যা আজ সমস্ত ভারতবর্ষের জন্য সেটা হচ্ছে দুই বিপরীতমুখী স্বার্থের সংঘাত। যে স্বাস্থ্য নীতি বেসরকারি স্বাস্থ্য-ব্যবস্থাকে (যার মুনাফাই প্রধান উদ্দেশ্য) সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার চাইতে বড় করে দেখতে চায়, যেখানে রোগ নিবারণের চাইতে অতি-বিশেষজ্ঞ দ্বারা রোগ নিরাময়ই প্রধান উদ্দেশ্য, যেখানে মেডিকেল শিক্ষা ব্যবস্থা, একজন চিকিৎসককে বিশেষজ্ঞ বা অতি-বিশেষজ্ঞ করে গড়ে তুলতে চায় যাতে সে দেশের বড়ো বড়ো বেসরকারি হাসপাতালে বা বিদেশে গিয়ে কাজ

করতে পারে, যেখানে প্রযুক্তি-নির্ভর শহরকেন্দ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাই কাম্য হয়ে যায়, সেখানে সাধারণ দরিদ্র ভারতবাসীর স্বার্থ কখনোই সুরক্ষিত থাকতে পারে না। ভারতের বিগত দুশো বছরের ইতিহাসে স্বাস্থ্য পরিষেবার এই ট্র্যাজিক পরিণতিই আজকে সবার কাছে সবচেয়ে বেদনাময় এবং পরিতাপের বিষয়।

এবার আমরা দৃষ্টি ফেরাবো দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রকৃত রূপ প্রত্যক্ষ করার জন্য। সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থা মিলিয়ে যে ব্যবস্থা ভারতের বুকে কায়েম হয়ে বসে আছে তাতে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ ছাড়া সবাই বেশ আতঙ্কিত কিন্তু প্রায় অসহায়। আমরা সরকারি ব্যবস্থার কথাই প্রথমে বলার চেষ্টা করি। যে কোনো দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় তিনটি জিনিস সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে— রোগ নিরাময় (curative), রোগ নিবারণ (preventive) এবং সাধারণ স্বাস্থ্য পরিবর্ধন (health promotion)। মানুষের আশু প্রয়োজনের মধ্যে পড়ে বলে রোগ নিরাময়ই প্রধান আলোচ্য হয় এবং যে কোনো মানুষ অসুস্থ হলেই তিনি আতঙ্কিত হয়ে পড়েন— এবার কী হবে? কোন্ ডাক্তার দেখাবেন, কোন্ হাসপাতাল বা নার্সিং হোমে যাবেন; সেখানে ঠিক ঠিক ভালো চিকিৎসা হবে তো? ইত্যাদি। সেই ব্রিটিশ যুগ থেকেই ভারতের বিভিন্ন বড়ো-ছোটো শহরগুলিতে হাসপাতাল স্থাপনা, ডিসপেন্সারী প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার পত্তন হয় এবং স্বাধীনতা-উত্তর যুগেও সেই ব্যবস্থা চলতে থাকে।

আমাদের দেশে আবহমান কাল ধরে চলে-আসা আয়ুর্বেদ-কবিরাজি চিকিৎসার পাশাপাশি এই চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু হলেও কালক্রমে এটাই তার কার্যকারিতা তথা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার জন্য প্রধান চিকিৎসা ব্যবস্থা হয়ে উঠল আপামর জনসাধারণের জন্য। এই চিকিৎসা ব্যবস্থার শীর্ষে ছিল দেশের মেডিকেল কলেজগুলো এবং কিছুটা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবায় নিজ গুণে অপরিহার্য হয়ে উঠল। স্বাধীনতা-উত্তর যুগেও প্রথম তিন-চার দশক এই স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা দেশের স্বাস্থ্য-পরিষেবায় নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পেরেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় সরকারি ধারাবাহিক অবহেলা, সময়োচিত আধুনিকীকরণের অভাব, অসম্ভব জনসংখ্যার চাপ, বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অন্যায় আবদার ও জুলুম এবং এক শ্রেণির কর্মকর্তাদের সীমাহীন দুর্নীতি ও ক্ষুদ্র স্বার্থপরতার জন্য ধীরে ধীরে এই ব্যবস্থা জীর্ণ থেকে জীর্ণতর হতে শুরু করল। যে কোনো সরকারি হাসপাতাল তা সে জেলা, মহকুমার স্তরেই হোক বা মেডিকেল কলেজগুলির স্তরে, সাধারণ মানুষের প্রাথমিক অভিজ্ঞতা সবসময়ই আতঙ্কিত হবার মতো। সবসময় প্রচুর লোকজনের ভিড় ও লম্বা লাইন, চারিদিকে আবর্জনা ও পূতিদুর্গন্ধময় পরিবেশ, যত্রতত্র স্বেচ্ছাসেবীর মুখোশে দালাল শ্রেণির অবাধ বিচরণ, এক শ্রেণির হাসপাতাল কর্মীর হৃদয়হীন ব্যবহার এবং জরুরি বিভাগগুলিতে প্রায়ই সিট নেই এই আশঙ্কা, আর বহির্বিভাগগুলিতে কোথায় গেলে সঠিক 'ডাক্তারবাবুকে' দেখানো যাবে সেই ব্যাপারে এক বিশৃঙ্খল দৃশ্য— এইসব মিলিয়ে বিগত কয়েক দশক ধরে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা এত বিষময় যে একজন মানুষ সরকারি হাসপাতালে যেতে সত্যি সত্যি ভয় পায়।

এই সরকারি স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার আর একটা দিকও আস্তে আস্তে অবহেলার শিকার হয়ে প্রায় অন্তঃসারশূন্য হতে চলেছে— সেটা হচ্ছে ডাক্তারী পঠন-পাঠন ও চিকিৎসা বিদ্যা। দেশের জনসংখ্যার তুলনায় ডাক্তার-নার্সের অপ্রতুলতা এক ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকে যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞ ও অতি-বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তৈরির দিকে বেশি ঝোঁক দেওয়া হচ্ছে আর সাধারণ লোকের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার প্রায় থাকছেই না। ডাক্তারী পঠন-পাঠন এবং পরীক্ষার মানরক্ষণ তথা উন্নয়নে প্রায় সবাই উদাসীন হয়ে পড়ছে। তারপর বিগত বেশ কিছুদিন ধরে বেসরকারি ব্যক্তি মালিকানায় মেডিকেল কলেজ স্থাপনা ও উৎসাহদানের মধ্য দিয়ে প্রচুর ডাক্তার তৈরি হতে চলেছে যাদের দৃষ্টিভঙ্গী আধুনিক অর্থনৈতিক সংস্কারের দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত। এই প্রভাব আস্তে আস্তে দেশের প্রায় সমস্ত ডাক্তার-সমাজকে গ্রাস করে নিতে যাচ্ছে। এর পরিণতি কী দাঁড়াবে একমাত্র ভবিষ্যতই জানে। যাই হোক, সরকারি স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার সমস্ত দোষ, ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতার কথা মনে রেখেও আজও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একটা কথা বলা যায় যে দেশের সিংহভাগ লোকের— প্রায় ৭০-৮০ শতাংশ লোকের স্বাস্থ্য পরিষেবার ভার তারাই বহন করছেন। এবং সামান্য কিছু অসুখ বাদে যা ৫ শতাংশ-এর বেশি হবে না বাকি ৯৫ শতাংশ রোগের চিকিৎসা যথেষ্ট যোগ্যতা দেখিয়েই করে যাচ্ছেন। একে বাঁচিয়ে রাখতে এবং এর উন্নতি ঘটাতে না পারলে সেটা হবে আমাদের দেশ ও জাতির দুর্ভাগ্য।

এবার আমরা দেখব দেশের বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ভূমিকা দেশের সামগ্রিক স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে যা বিশ্বময় অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ ভারতের মাটিতে সযত্নে রোপিত ও লালিত-পালিত হয়ে চলেছে। অর্থনৈতিক সংস্কারের আগেও ভারতে বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা ছিল, কিন্তু তার পেছনে তেমন সরকারি আনুকূল্য, অনুদান ও উৎসাহ ছিল না। আমরা এর আগেই দেখেছি Health Sector Reforms (স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা সংস্কার)-এর ধাক্কায় এই সংস্কার চালু হয়েছিল নব্বুইয়ের দশকের গোড়ার দিকে। ভারতবর্ষ তার 'জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি'তে (২০০২) কীভাবে এই ব্যবস্থাকে স্বাগত জানিয়েছিল সরকারি বদান্যতা ও ভরতুকি দিয়ে, কীভাবে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহ জোগানো হয়েছিল। তার মধ্যে ছিল প্রায় বিনামূল্যে জমি ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে অভূতপূর্ব কর ছাড়। বিনিময়ে ছোট্ট শর্ত ছিল কিছু গরীব রোগীকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা দিতে হবে। দিল্লি প্রাদেশিক সরকার বিচারপতি কুরেশি কমিটি (Justice Qureshi Committee) নিয়োগ করেছিল দিল্লির চারদিকে বেড়ে ওঠা বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালগুলির কাজকর্ম খতিয়ে দেখার জন্য। এই কমিটি তার প্রতিবেদনে জানিয়েছিল যে গরীব রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসার শর্ত প্রায় কোনো হাসপাতালই মানেনি। আশ্চর্যজনকভাবে, ঐ শর্ত-সম্বলিত হয়ে এখনও বেসরকারি হাসপাতালগুলি কাজ করে যাচ্ছে, উপরন্তু নতুন নতুন বেসরকারি হাসপাতাল স্থাপিত হয়ে চলেছে। আমাদের কলকাতার এক বিখ্যাত বেসরকারি হাসপাতালের প্রকাশিত পত্রিকায় বেসরকারি হাসপাতালগুলির মানসিকতা সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাঁরা দেখাচ্ছেন, আগামী দিনগুলিতে বেসরকারি হাসপাতালগুলির বৃদ্ধির সম্ভাবনা খুব

বেশি— প্রায় ১০ লক্ষ নতুন হাসপাতাল শয্যা ভারতবর্ষে সংযোজিত হতে চলেছে আগামী ৫ বছরের মধ্যে। তার ৮৮ শতাংশই হবে বেসরকারি স্বাস্থ্য-ব্যবস্থায়। কেননা সরকারি স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থাভাব। তাছাড়া সেখানে উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তার ও নার্সেরও অভাব আছে তার জন্য প্রকৃত স্বাস্থ্য পরিষেবায় ঘাটতি রয়েছে। এমনকি তথাকথিত সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের সুবিধাও ভারতের সব রাজ্যে সমানভাবে গড়ে ওঠেনি। তাই তাঁরা দেখছেন আগামী দিনে বেসরকারি স্বাস্থ্য-ব্যবস্থাই ভারতে প্রধান ভূমিকা পালন করবে এবং এরই দৌলতে ভারতবর্ষ ইতিমধ্যে বিশ্বের স্বাস্থ্য ভ্রমণার্থীদের (Health Tourists) এক আকর্ষণীয় গন্তব্য স্থল হয়ে উঠছে। বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় (সরকারি ব্যবস্থার তুলনায়) কত বেশি সুবিধা হয়েছে তার একটা হিসাব দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে এই ব্যবস্থায় মানুষকে অপেক্ষা করতে হয় না, দ্রুত স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়া যায়, নিজের পছন্দমতো হাসপাতালে নিজের সুবিধামতো সময়ে পরিষেবা পাওয়া যায়, নিজের পছন্দের ডাক্তার বা বিশেষজ্ঞ পাবার কোনো অসুবিধা নেই, এমন অনেক চিকিৎসা-ব্যবস্থা আছে যা সরকারি স্বাস্থ্য-ব্যবস্থায় পাওয়া যায় না, কিন্তু বেসরকারি ব্যবস্থায় সহজলভ্য এবং সর্বোপরি ব্যয় নির্বাহের জন্য মানুষ বেসরকারি স্বাস্থ্য বীমা, কর্পোরেট সংস্থা দ্বারা অর্থ প্রদান অথবা সরাসরি মূল্য প্রদানের সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। এই পত্রিকায় বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবাকে স্বাস্থ্য শিল্প বলে (Health Care Industry) মনে করা হয়েছে এবং এই শিল্প যাতে আর্থিকভাবে সক্ষম ও সজীব হয় তার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে এবং তার জন্য বিভিন্ন পরামর্শ ও উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সমস্ত উপদেশ ও পরামর্শের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলা হয়েছে স্বাস্থ্য বিপণন বা Health Marketing। এর মধ্যে প্রথমেই নজর দিতে বলা হয়েছে যে সব রুগী বেসরকারি চিকিৎসা পরিষেবা নিতে আসবেন তাদের উৎস ভূমিকে (referral base) আরও বিস্তৃত করতে হবে, সমাজের বিভিন্ন আর্থিক শ্রেণিকে বেসরকারি চিকিৎসা পরিষেবা সম্বন্ধে শিক্ষিত ও ওয়াকিবহাল করে তুলতে হবে। বিশেষ করে কর্পোরেট শ্রেণির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে হবে যদি আর্থিক দিক দিয় এই শিল্পকে বেঁচে থাকতে হয়। অতি উত্তম রুগী পরিষেবা সবচেয়ে কম বা গ্রহণযোগ্য মূল্যে সবচেয়ে কম সময়ে পৌঁছে দেওয়াই এই শিল্পের প্রধান মন্ত্র। বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার এইসব সংকল্প, উপদেশ তথা উচ্চাঙ্ক্ষায় কোনো দোষ নেই এবং কারও আপত্তি থাকার কথাও নয়। কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ ভীষণ ভয় পেয়ে যাই যখন দেখি এই কথাগুলির সর্বশেষে এক গুরুত্বপূর্ণ আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে এবং এক সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ভারতে বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবা তথা চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা ও তাদের গুণগত মানের মধ্যে এত তারতম্য ও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় যে বিভিন্ন ধরনের অপচিকিৎসা (mal practices), অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয় রোগ নির্ণয় পরীক্ষা (irrelevant and unnecessary diagnostic tests), শল্য চিকিৎসার (surgical) অপপ্রয়োগ ও উপশল্য পদ্ধতির (interventional) অপব্যবহার ভীষণভাবে ঘটে থাকে। বেসরকারি স্বাস্থ্য সংস্থাগুলিকে কিন্তু চিকিৎসা-পরিষেবা রূপ এই মহান পেশার নৈতিক আদর্শকে সর্বোচ্চ

সম্মান দিয়ে এইসব কুৎসিত চিকিৎসা-পরিষেবার বিরুদ্ধে ভীষণভাবে খড়্গহস্ত হয়ে উঠতে হবে। না হলে এই স্বাস্থ্য শিল্প ও তাদের পরিষেবার অগ্রগতি অবরুদ্ধ হয়ে পড়বে। অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে সারা ভারতবাসী আজ বুঝতে পারছে যে এই আশঙ্কা কতখানি সত্যি! বেসরকারি স্বাস্থ্য সংস্থাগুলির বেশির ভাগই দেশের আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাবানদের প্রশ্রয়ে ও আনুকূল্যে বেড়ে উঠেছে। তাই এদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ কিছু বলতে ভীষণ ভয় পায় বা জানে যে, বললে কিছু হবে না। কিন্তু একটু কান পাতলেই সবাই শুনতে পাবেন কত অজস্রভাবে এইসব সংস্থা স্বাস্থ্য পরিষেবা তথা রোগ চিকিৎসার নাম দিয়ে একজন সাধারণ দরিদ্র বা নিম্নবিত্তের অর্থ আত্মসাৎ করতে পিছপা হয় না। একজন সাধারণ জ্বরের রোগীকে বিভ্রান্ত করে আইটিইউ (ITU)-তে ভর্তি হতে বাধ্য করা এবং প্রতিদিন পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকার খরচের ধাক্কায় ফেলে দেওয়া বহু বেসরকারি হাসপাতালেরই আজ এক পরিচিত কৌশল। পরিষেবাভিত্তিক মূল্য প্রদান (fee for service payment) যা আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের এক শর্তের মধ্যে ছিল, এটা বহু হাসপাতালেরই আজ এক সহজ উপায় হয়ে গেছে যার সাহায্যে রুগীর বিল (bill) বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। চিকিৎসা-শাস্ত্রে একজন সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা স্বাস্থ্য-পরিষেবা-প্রদানকারী সংস্থাগুলির কাছে খুবই সহজ ব্যাপার। তাছাড়া বহু ক্ষেত্রেই মিথ্যে ভয় দেখানো হয় যে উপদিষ্ট পদ্ধতি বা চিকিৎসা-পরিষেবাগুলি না দেওয়া হলে রুগীর চিকিৎসা সফল হবে না বা যে কোনো সময়ে রুগীর প্রাণ-সংশয় হতে পারে। আর এক অদ্ভুত নিয়ম বেসরকারি হাসপাতালগুলি অনুসরণ করে চলে যার সাহায্যে রুগীর বিল (bill) সহজেই প্রচুর বেড়ে যায়। একজন ডাক্তারবাবু যখন কোনো এক রুগীকে দেখেন যিনি হয়তো কম বেড-ভাড়ায় ভর্তি হয়েছিলেন (যেমন চারশ বা পাঁচশ টাকা)— তখন যদি তাঁর কনসাল্টেন্সি ফি (Consultancy Fee) চারশ টাকা (400/-) হয়, সেই ডাক্তারবাবুরই ফি অন্য রোগীর ক্ষেত্রে যিনি বেশি বেড-ভাড়ায় ভর্তি হয়েছেন (যেমন পাঁচ হাজার, দশ হাজার বা পনর হাজার) অনেক বেড়ে কমবেশি দু'হাজার পাঁচশ টাকা (2,500/-) পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। ঠিক একই নিয়মে রোগ নির্ণয় পরীক্ষাগুলির (Diagnostic Test Charge) মূল্যও স্বল্পভাড়ার বেডের চাইতে অধিক ভাড়ার বেডের ক্ষেত্রে কয়েকগুণ বেড়ে যায়। এইরকম আরও অনেক অনৈতিক অদৃশ্য উপায় এইসব হাসপাতালগুলি অনুসরণ করে চলে যাতে রোগীর বিল (bill) বহুগুণ বেড়ে যায়। এটা কি খুবই পরিতাপের বিষয় নয় যে, স্বাস্থ্য-পরিষেবা তথা মানুষের জীবন-দান ব্রতের আড়ালে বেসরকারি স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা আসলে এক অর্থগৃধ্ন-পরিষেবা হয়ে উঠছে? বেসরকারি স্বাস্থ্য-ব্যবস্থাকে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হওয়ার জন্য রোগীর উৎসভূমি বর্ধনের (referral base) যে উপদেশ প্রথমেই দেওয়া হয়েছিল— তার ফলিত-প্রয়োগের দিকে তাকিয়ে দেখলে যে কোনো সুস্থ আদর্শ মানুষ চমকে উঠতে পারেন। বেসরকারি হাসপাতালগুলির দ্বারা নিযুক্ত অসংখ্য এজেন্ট (agent) বা দালাল কলকাতা বা অনুরূপ বড়ো বড়ো শহরগুলো ছাড়াও ছোটো ছোটো মফঃস্বল শহর ও গ্রামগুলিতে ভীষণভাবে সক্রিয়— যারা কমিশনভিত্তিতে কাজ করে থাকে। সামান্য কমিশনের লোভে বহুক্ষেত্রেই এরা সমাজের অসুস্থ, দরিদ্র, নিম্ন

ও মধ্যবিত্তদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে নিয়ে এসে ভর্তি করে দেয় এবং প্রকৃত অর্থেই এদের অনেকে 'ধনে-প্রাণে' মারা পড়েন। প্রতিদিনই বেশ কিছু রোগী প্রায় প্রত্যেকটি বেসরকারি হাসপাতাল থেকেই বন্ড (Risk bond)-এ সই করে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়। চিকিৎসার আর্থিকভার বহন করা তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। নইলে পুরো পরিবারটিই হয়তো আর্থিকভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। বেসরকারি হাসপাতালগুলি থেকে এই বন্ড-এ সই করে রোগীর বেরিয়ে যাওয়া আজকাল খুবই পরিচিত দৃশ্য এবং খুবই বেদনাদায়ক।

যাই হোক, এই সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার মিলিত চেহারার দিকে তাকিয়ে আজ যে কোনো ভারতবাসী আতঙ্কিত হয়ে উঠবেন অসুস্থ হলে তিনি কোথায় যাবেন! তথাকথিত অর্থনৈতিক সংস্কার ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য-ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন নিয়ে এসেছে, সেটাই কি সবার কাছে কাঙ্ক্ষিত ছিল? উদ্দেশ্যপূরণের সামান্যতমও কি সফল হয়েছে? একজন সাধারণ মানুষের কাছে এই প্রশ্নগুলির কোনো উত্তর নেই আর কেই বা উত্তর দেবে?

আমরা এবার সামান্য কিছু পরিসংখ্যানের দিকে তাকাব — যাতে স্বাস্থ্য ছাড়াও ভারতের সামাজিক ও আর্থিক উন্নতিরও একটা রূপরেখা পাওয়া যেতে পারে। এক বিশেষজ্ঞ কমিটি তাদের প্রতিবেদনে দেখিয়েছে গ্রামীণ দারিদ্র্য ১৯৭৩-৭৪ সালের তুলনায় ২০০৪-২০০৫ সালে ৭২ শতাংশ থেকে বেড়ে ৮৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ২০০৯ সালে ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে তুলনামূলক 'ক্ষুধা-সূচক' (Indian State Hunger Index) প্রস্তুত করা হয়েছিল বিশ্ব ক্ষুধা-সূচককে (Global Hunger Index - 2008) মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করে। দেখা যায় ভারতের প্রায় সমস্ত রাজ্যই আতঙ্কজনক অবস্থার (Alarming category) মধ্যে পড়ছে— কেউই নিম্ন বা মধ্যম (Low or moderate category) অবস্থার মধ্যেও পড়ছে না। মধ্যপ্রদেশও অতি-আতঙ্কজনক (extremely alarming) অবস্থার মধ্যে আছে। আর ভারতের যে মাত্র চারটি রাজ্য (পাঞ্জাব, কেরালা, অন্ধ্র এবং আসাম) চিন্তাজনক অবস্থার (serious category) মধ্যে পড়ছে, তারাও বিশ্বের অনেক সাধারণ দেশগুলির (যেমন সাব-সাহারান আফ্রিকার গাবন, হন্ডুরাস, ভিয়েতনাম) বেশ নিচে রয়েছে ক্ষুধা-সূচক মাত্রায়। স্বাস্থ্য পরিসংখ্যানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচ্য হয় আয়ু সম্ভাব্যতা (life expectancy), শিশু মৃত্যু-হার (Infant Mortality Rate) এবং প্রসূতি মৃত্যু হার (Maternity Mortality Rate)। ভারতবর্ষের বর্তমান গড় আয়ু ৬৫ বৎসর (১৯৪৭ সালে ছিল ৩২ বছর, কিন্তু উন্নত দেশগুলির তুলনায় এখনও ১০ গুণ বেশি), শিশু মৃত্যু হার প্রতি হাজারে ৩৭ (যদিও উন্নত দেশগুলির ১০ গুণ বেশি) এবং প্রসূতি মৃত্যু হার প্রতি লক্ষে ২৫৪ (১৯৮০-তে ছিল ৬৭৭ যদিও উন্নত দেশগুলির তুলনায় কমপক্ষে ১৫ থেকে ৫০ গুণ বেশি)। অপুষ্টির (Malnutrition) পরিসংখ্যান আমাদের বলছে পাঁচ বছরের কম বয়েসি শিশুদের অপুষ্টি ৬৭ শতাংশ থেকে (১৯৭৯ সালে) কমে দাঁড়িয়েছে ৪৪ শতাংশ (২০০৬ সাল) যদিও উন্নত দেশগুলির তুলনায় এটা কুড়িগুণ বেশি। ভারতবর্ষের তিন বছর বয়েসিদের মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশই

স্বল্প ওজন বিশিষ্ট (under weight)। পরিসংখ্যানের মূল্য যতই হোক প্রকৃত অবস্থার নিরিখে কখনোই তা 'হিমশৈলের' চাইতে বেশি কিছু নয়। অর্থনৈতিক সংস্কার অবশ্য ভারতের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত এবং কিছুটা দরিদ্র ও নিম্নবিত্তের মধ্যে জীবনযাত্রা ও জীবনশৈলীর মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছে। ভোগবাদী জীবনদর্শন ভারতীয় সমাজকে ভালভাবে গ্রাস করে নিয়েছে— তার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ এসেছে ভয়াবহ পরিবেশ দূষণ, মদ্যপান ও ধূমপানের বাড়বাড়ন্ত এবং প্রচুর পরিমাণে স্নেহজাতীয় খাদ্যের ব্যবহার। ফল হয়েছে উন্নত দেশগুলির অসুখগুলিও ভারতবর্ষে অনেক বেশি করে দেখা দিতে শুরু করেছে। বাস্তবে, ডায়াবিটিস, অতি-রক্তচাপ (Hypertension), হৃদরোগ (Coronary artery diseases), ক্যান্সার প্রভৃতি রোগগুলো ভারতের বুকে মহামারীর আকার নিতে চলেছে। ভারতবর্ষের কাছে স্বাস্থ্য নিয়ে এখন দ্বৈত সমর (dual fight)— একদিকে পুরনো সমস্যাগুলি যেমন সংক্রামক রোগ, অপুষ্টি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, সর্বাত্মক শিশু টীকাকরণের অভাব (ভারতের ৬৭ শতাংশ শিশুর টীকাকরণ অসম্পূর্ণ) ইত্যাদি আর অন্যদিকে ডায়াবিটিস্, অতি-রক্তচাপ, হৃদরোগ, ক্যান্সার ইত্যাদি আধুনিক রোগগুলি। ভারত সরকার অবশ্য এর মধ্যে ঘোষণা করেছে Health Care for all by 2020 (২০২০ সালের মধ্যে সকলের জন্য চিকিৎসা পরিষেবা) এবং distribution of free medicines for all (সবার জন্য বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ) বিশেষ করে নিম্নবিত্তের জন্য। সুদিনের আশা ভারতবাসীরা কোনোদিনই ছাড়েনি।

সারা বিশ্ব আজ 'বিপুলা পৃথিবী' থেকে এক ক্ষুদ্র 'গ্রাম বিশ্বে' পরিণত (Global Village) হয়েছে। এর সম্পূর্ণ কৃতিত্বের অধিকারী একমাত্র বিজ্ঞানীরা এবং তাঁদের গত দু-শ বছরের নিরলস বৈজ্ঞানিক সাধনা। দুঃখের বিষয় বিশ্বের সমস্ত দেশে এই সাধনার সুফল পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাদের ভূমিকা চিরকালই অপাঙ্‌ক্তেয় রয়ে গেছে। সংস্কারের প্রবক্তা এক অত্যাধুনিক অর্থনীতিবিদ্ গোষ্ঠীকে সঙ্গী করে রাজনীতিবিদ্‌রাই সারা পৃথিবী পরিচালনা করছেন— হয়ত চিরকালই করে এসেছেন। আমরা এই প্রবন্ধের প্রথমেই বলেছি আজকের আধুনিক চিকিৎসক আর কোনো ব্যক্তি-চিকিৎসক নন— তিনি এক অত্যাশ্চর্য চিকিৎসা ব্যবস্থার হাতে যন্ত্রচালিত পুতুলের মতো দম দেওয়া এক ব্যক্তিত্ব। এই অত্যাশ্চর্য চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রত্যক্ষভাবে আধুনিক অর্থনৈতিক দিগ্‌দর্শনের দ্বারা চালিত অভূতপূর্ব উন্নত যন্ত্রনির্ভর এক চিকিৎসা ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় একজন চিকিৎসক নিজেকে ভাবতে শিখেছেন অর্থনীতির এক মাধ্যম (economic agents) হিসাবে যিনি রোগীর চিকিৎসার স্বার্থে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন যে সব ব্যবস্থাপত্রাদি রয়েছে তাদের কত ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারছেন এবং তাঁর ও রোগীর কাছে যত সুযোগ আসছে তাদের সদ্ব্যবহার করতে পারছেন! (... economists are interested in the degree to which physicians respond to various incentives, both those that they face and those facing their patients in deciding how to deploy the resources they control....) অর্থনীতির কতকগুলি প্রাথমিক পাঠ তিনি শিখে নিয়েছেন— একজন রুগী দেখার জন্য নিজের কতটা সময় দিতে হবে, কোন্ কোন্ পরীক্ষা করাতে হবে, কোন্ কোন্ ঔষধের ব্যবস্থা দিতে হবে, কোনো চিকিৎসা

স্বল্প ওজন বিশিষ্ট (under weight)। পরিসংখ্যানের মূল্য যতই হোক প্রকৃত অবস্থার নিরিখে কখনোই তা 'হিমশৈলের' চাইতে বেশি কিছু নয়। অর্থনৈতিক সংস্কার অবশ্য ভারতের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত এবং কিছুটা দরিদ্র ও নিম্নবিত্তের মধ্যে জীবনযাত্রা ও জীবনশৈলীর মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছে। ভোগবাদী জীবনদর্শন ভারতীয় সমাজকে ভালভাবে গ্রাস করে নিয়েছে— তার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ এসেছে ভয়াবহ পরিবেশ দূষণ, মদ্যপান ও ধূমপানের বাড়বাড়ন্ত এবং প্রচুর পরিমাণে স্নেহজাতীয় খাদ্যের ব্যবহার। ফল হয়েছে উন্নত দেশগুলির অসুখগুলিও ভারতবর্ষে অনেক বেশি করে দেখা দিতে শুরু করেছে। বাস্তবে, ডায়াবিটিস, অতি-রক্তচাপ (Hypertension), হৃদরোগ (Coronary artery diseases), ক্যান্সার প্রভৃতি রোগগুলো ভারতের বুকে মহামারীর আকার নিতে চলেছে। ভারতবর্ষের কাছে স্বাস্থ্য নিয়ে এখন দ্বৈত সমর (dual fight)— একদিকে পুরনো সমস্যাগুলি যেমন সংক্রামক রোগ, অপুষ্টি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, সর্বাত্মক শিশু টীকাকরণের অভাব (ভারতের ৬৭ শতাংশ শিশুর টীকাকরণ অসম্পূর্ণ) ইত্যাদি আর অন্যদিকে ডায়াবিটিস্, অতি-রক্তচাপ, হৃদরোগ, ক্যান্সার ইত্যাদি আধুনিক রোগগুলি। ভারত সরকার অবশ্য এর মধ্যে ঘোষণা করেছে Health Care for all by 2020 (২০২০ সালের মধ্যে সকলের জন্য চিকিৎসা পরিষেবা) এবং distribution of free medicines for all (সবার জন্য বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ) বিশেষ করে নিম্নবিত্তের জন্য। সুদিনের আশা ভারতবাসীরা কোনোদিনই ছাড়েনি।

সারা বিশ্ব আজ 'বিপুলা পৃথিবী' থেকে এক ক্ষুদ্র 'গ্রাম বিশ্বে' পরিণত (Global Village) হয়েছে। এর সম্পূর্ণ কৃতিত্বের অধিকারী একমাত্র বিজ্ঞানীরা এবং তাঁদের গত দু-শ বছরের নিরলস বৈজ্ঞানিক সাধনা। দুঃখের বিষয় বিশ্বের সমস্ত দেশে এই সাধনার সুফল পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাদের ভূমিকা চিরকালই অপাঙ্‌ক্তেয় রয়ে গেছে। সংস্কারের প্রবক্তা এক অত্যাধুনিক অর্থনীতিবিদ্ গোষ্ঠীকে সঙ্গী করে রাজনীতিবিদ্‌রাই সারা পৃথিবী পরিচালনা করছেন— হয়ত চিরকালই করে এসেছেন। আমরা এই প্রবন্ধের প্রথমেই বলেছি আজকের আধুনিক চিকিৎসক আর কোনো ব্যক্তি-চিকিৎসক নন— তিনি এক অত্যাশ্চর্য চিকিৎসা ব্যবস্থার হাতে যন্ত্রচালিত পুতুলের মতো দম দেওয়া এক ব্যক্তিত্ব। এই অত্যাশ্চর্য চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রত্যক্ষভাবে আধুনিক অর্থনৈতিক দিগ্‌দর্শনের দ্বারা চালিত অভূতপূর্ব উন্নত যন্ত্রনির্ভর এক চিকিৎসা ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় একজন চিকিৎসক নিজেকে ভাবতে শিখেছেন অর্থনীতির এক মাধ্যম (economic agents) হিসাবে যিনি রোগীর চিকিৎসার স্বার্থে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন যে সব ব্যবস্থাপত্রাদি রয়েছে তাদের কত ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারছেন এবং তাঁর ও রোগীর কাছে যত সুযোগ আসছে তাদের সদ্ব্যবহার করতে পারছেন! (... economists are interested in the degree to which physicians respond to various incentives, both those that they face and those facing their patients in deciding how to deploy the resources they control....) অর্থনীতির কতকগুলি প্রাথমিক পাঠ তিনি শিখে নিয়েছেন— একজন রুগী দেখার জন্য নিজের কতটা সময় দিতে হবে, কোন্ কোন্ পরীক্ষা করাতে হবে, কোন্ কোন্ ঔষধের ব্যবস্থা দিতে হবে, কোনো চিকিৎসা

পদ্ধতির (procedure) ব্যবস্থা করতে হবে কিনা, অন্য কোনো ডাক্তারের কাছে পাঠানো হবে কি না, রোগীকে ভর্তি করতে হবে কিনা ইত্যাদি প্রশ্নগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক 'উৎসাহ' সম্বন্ধে সজাগ থাকা। বিগত শতাব্দীর সত্তর কি আশির দশক থেকেই চিকিৎসাশাস্ত্রের অভূতপূর্ব উন্নতি হতে শুরু করেছে নতুন নতুন প্রযুক্তি এসে। চিকিৎসকবৃন্দ আজ বিশেষজ্ঞ, অতি-বিশেষজ্ঞ, উপ-বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি বিভিন্ন উপধায় বিভক্ত। একজন রুগীকে তাঁর হৃদয় (heart), মস্তিষ্ক (Brain), কিডনি (kidney), যকৃৎ (liver) ইত্যাদি ভাবেই দেখতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। সম্পূর্ণ রোগীকে বোঝার মতো অন্তর্দৃষ্টি প্রায় সবাই হারিয়ে ফেলছেন। যন্ত্র নির্ভর আধুনিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ আজ সবাই প্রকৃত অর্থে পরাধীন ব্যক্তিত্ব। আধুনিক চিকিৎসক ও চিকিৎসা-ব্যবস্থার এই বাস্তব চেহারার জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি যতটা দায়ী, তার চেয়ে অনেক বেশি দায়ী অর্থনীতির আধুনিক দর্শন। একটা ছোট উদাহরণের দিকে আমরা তাকাই— এমআরআই (MRI Scan) নামক পরীক্ষাটি বেশ দামি এবং ভীষণ প্রয়োজনীয় পরীক্ষা বিশেষ বিশেষ চিকিৎসার জন্য। এই যন্ত্রটি চিকিৎসার জন্য কানাডা দেশে যত ব্যবহৃত হয়, তার চাইতে অন্তত পাঁচগুণ বেশি ব্যবহার করা হয় পার্শ্ববর্তী দেশ আমেরিকায়। তাই চিকিৎসার জন্য কী লাগবে, কত পরীক্ষা করতে হবে, কত খরচ হবে ইত্যাদি আর কোনো ব্যক্তি-চিকিৎসকের প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করছে না। এক সমীক্ষা দেখিয়েছে ১৯৭০ সালের আগে পর্যন্ত যখন রোগ নির্ণয়ের জন্য (Diagnosis) খুব কম যন্ত্র ব্যবহার করা হত আর ১৯৯০ সালের পরে যখন প্রায় সমস্ত অত্যাধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে রোগ নির্ণয়ের জন্য (Diagnosis) — তাদের মধ্যে রোগ নির্ণয় নির্ভুলতার (Diagnostic accuracy) ফারাক মাত্র ২ থেকে ৩ শতাংশ, কিন্তু ব্যয় বৃদ্ধির হার বহুগুণ। আজ ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার প্রকৃত রূপদর্শনে ভারতের প্রায় সমস্ত জনগণই নিজেদের বঞ্চিত ও বিশ্বাসহত মনে করেন। আগেই বিবেকানন্দ সমস্ত ভারতবর্ষের জন্য প্রশ্ন রেখে গেছেন— পরানুকরণ দ্বারা কি প্রকৃত 'উচ্চাধিকার' লাভ হয়? ❑

তথ্যসূত্র:

১. Speaking for ourselves: Development of health-care services in India – by: Vikas Bajpai, Anoop Saraya – The National Medical Journal of India, Vol. 26, No. 2, 2013.

২. Global issues in Medicine: By Jim Young Kim / Paul Farmer / Joseph Rhetiyan: Harrison's Principles of Internal Medicine; 18th Edition 2012 (Page-9)

৩. The Economics of Medical Care: By Joseph P. Newhouse: Harrison's Principles of Internal Medicine; 18th Edition 2012 (e-chapter-3)

৪. Health care achievements of Post-independent India: by Dr Poonam Kuruganti (last updated, October 3, 2012)

৫. Economic Liberalisation in India: From Wikipedia, the free Encyclopedia

৬. Peerless: Arogya – No. 2, Month February, 2009

৭. India in comparison with other countries in 2009. Source: World Health Report, 2011